শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের পত্রিকা

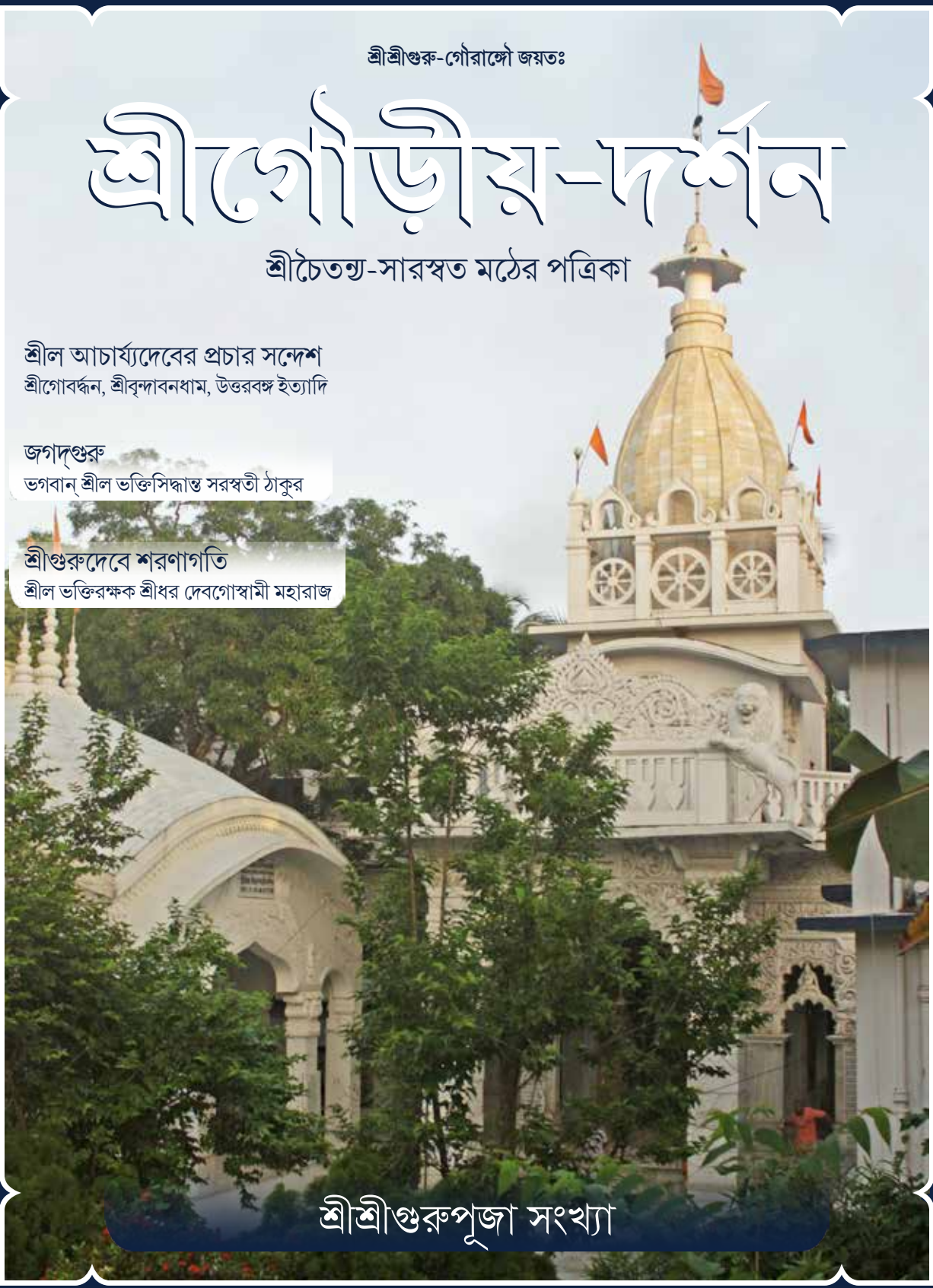

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার সন্দেশ
শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীবৃন্দাবনধাম, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি

জগদ্‌গুরু
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগুরুদেবে শরণাগতি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুপূজা সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীমঠের সত্তর বছর বার্ষিক সংখ্যা
৫২৭ গৌরাব্দ; ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; ২০১২ খৃষ্টাব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নাদীয়া

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-বিচিন্ন-কর্ত্রী বিবুধ-বহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী॥

নিখিলভুবনমোহিনী মায়াকে ছিন্নবিছিন্নকারিণী,
জ্ঞানিগের সাধ্য মুক্তিরূপ মোহের বিনাশ-কারিণী,
বিধিমার্গের সাধনাকে শিথিল করেরাগমার্গের আরাধ্য রাধারমণের বসতি
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদ বিলাস করুন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও গৌড়ীয়-নবযুগ-প্রবর্ত্তক
বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যভাস্কর অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্থাপক
শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

তদ্ কৃপাভিষিক্ত রূপানুগ সুসিদ্ধান্ত পারঙ্গত বিশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পায় ও তাঁর মনোনীত
শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচর্য্য মহারাজের

অনুপ্রাণায় শ্রীভক্তিকমল ত্যাগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং শ্রীমহামন্ত্র দাসাধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই-দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেই দিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মরতিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃতসেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যান্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবর নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সূচীপত্র

শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমা ২

শ্রীল পরম গুরু মহারাজের আবির্ভাব মহোৎসব ৬

শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুপূজা মহোৎসব ১০

উত্তরবঙ্গ প্রচার ১২

বিবিধ সন্দেশ ১৪

জগদ্‌গুরু ১৬
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগুরুদেবে শরণাগতি ২০
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা ২৪
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগুরুপূজা ২৭
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

উপমন্যু ৩০

শ্রীগুরুতত্ত্বের পরিশিষ্ট ৩২
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা

পূর্ব্ব বছরের ন্যায় এই বছরেও শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয় শ্রীকার্ত্তিক মাসে শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের শ্রীগোবার্দ্ধন ধামস্থিত শ্রীল শ্রীধর স্বামী সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

২৮ কার্ত্তিক, শ্রীগৌরপ্রতিপদ তিথিতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মহামহোৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ বর্ণনা করিয়াছিলেন কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শরণাগত ভক্তদের রক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের কৃপার প্রভাবে সমস্ত ভক্তবৃন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত পংক্তি "'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ' বিশ্বাস পালন"-এর অর্থ গভীরভাবে হৃদয়াঙ্গম করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী সেবাশ্রমের নূতন সিংহ দ্বার এবং শ্রীশ্রীগুরু-অনুগিরিরাজ মন্দিরের পাশে শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীপুষ্পসমাধি।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা উপলক্ষে রাজভোগ নিবেদন করা হইতেছে।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ভক্তবৃন্দ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম গমন করেন যেখানে তাঁহারা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দির পার্শ্বে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা উপলক্ষে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ বিশেষ পাঠ সমাপ্ত করিয়া শ্রীঅনুগিরিরাজ-জীউর অভিষেক করিয়াছিলেন।

পনেরো দিনের মধ্যে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আাচার্য্য মহারাজ ভক্তবৃন্দ লইয়া একশতেরও অধিক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্থানসমূহ নিম্নরূপঃ

রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, কুসুমসরোবার,
মানসগঙ্গা, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, কদমখণ্ডী,
গোকুল-মহাবণ, দাউজী মন্দির, রমণরেতি,
ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মথুরা, অক্ষরধাম, বিড়লা মন্দির,
কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, ঋষিকেশ ইত্যাদি।

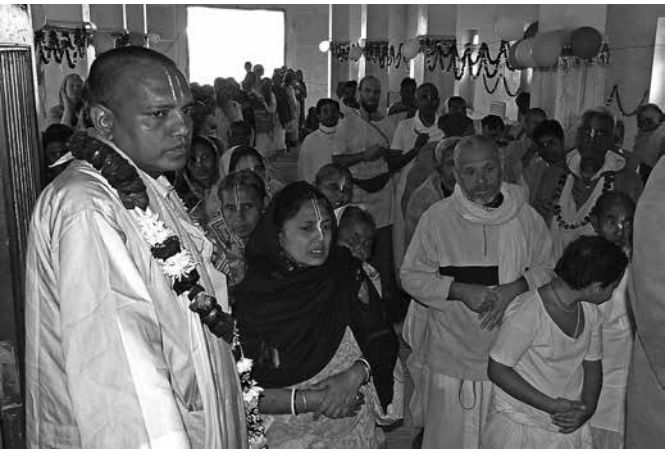

শ্রীল পরম গুরু মহারাজের আবির্ভাব মহোৎসব

২২শে কার্ত্তিক, শ্রীকৃষ্ণনবমী তিথিতে আমাদের পরমারাধ্যতম পরম গুরু মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের আনুগত্যে মহোৎসবে আগত ভাগ্যবান অতিথিবৃন্দ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীযমুনা দর্শন করিয়া শ্রীকোলদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তীকাল সকলে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের পদ্মমুখ হইতে শ্রীল পরম গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ সকলকে দেখাইয়াছিলেন যে শ্রীগুরুপরম্পরা পূজা করিতে প্রথমে শিষ্য তার নিজের দীক্ষাগুরুকে নিবেদন করিয়া অতঃপর শিষ্যের দীক্ষাগুরুর গুরুদেবকে নিবেদন করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ তাঁহার স্বলিখিত শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন:

গুরুরূপহরিং গৌরং রাধারুচিরচাবৃতম্।
নিত্যং নৌমি নবদ্বীপে নামকীর্ত্তননর্ত্তনৈঃ ॥

"শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি-আচ্ছাদিত হইয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যকাল বন্দনা করি, যিনি এই নবদ্বীপধামে প্রচুর নামসংকীর্ত্তন ও নৃত্যবিলাসপরায়ণ।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই আমাদের পরম গুরু মহারাজের প্রধান চিন্তনীয় ও বরণীয় বিষয় এবং ইহা সকলের উপলব্ধির জন্য শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল পরম গুরু মহারাজের শ্রীবিরহমিলন সমাধি মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীবিগ্রহকে শ্রীল পরম গুরু মহারাজের পাশে স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-ভাবধারার আধারস্বরূপ শ্রীল পরম গুরু মহারাজ কথিত বিরহমিলন আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাঙ্গলার এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অগনিত ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে আসিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুপূজা মহোৎসব

বাংলার অসংখ্য ভক্তবৃন্দ এবং পাশ্চাত্য দেশ যথা তুর্কী, ভেনেজুয়েলা, রাশিয়া ও আমেরিকা হইতে প্রচুর বিদেশী ভক্তবৃন্দ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীএকচক্রাধাম আসিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের আমেরিকার মিশনের মূখ্য প্রচারক শ্রীল ভক্তিপাবন জনার্দ্দন মহারাজ প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রত্যেকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থানে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের অতিমর্ত্ত্য গুণকীর্ত্তন করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্বাদ পাইয়াছিলেন।

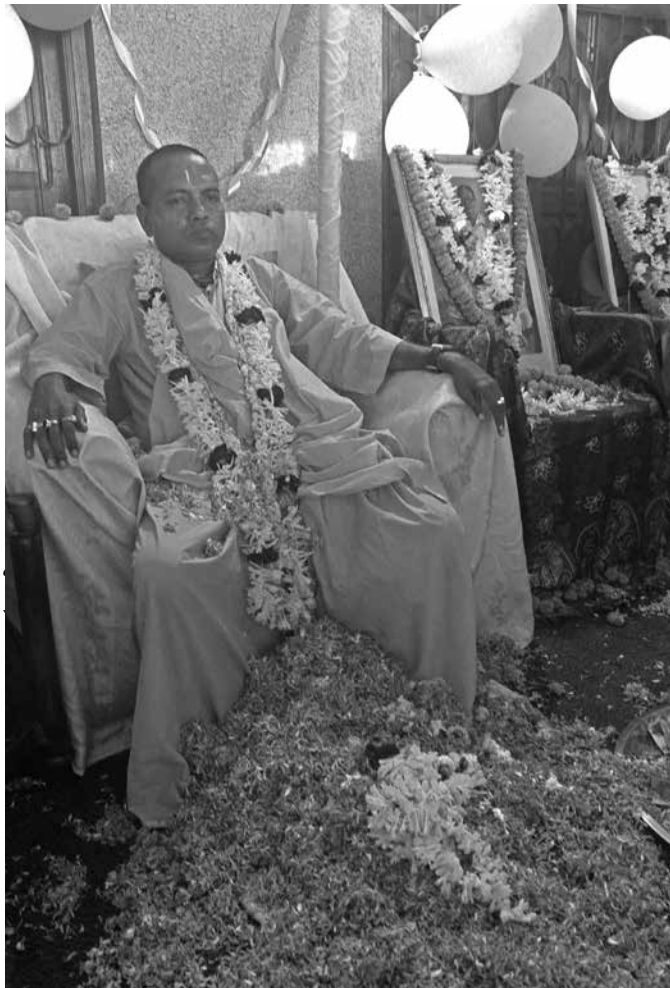

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ভক্তসমূহে ঔদার্য্যময় হৃদয় উচ্ছ্বসিত সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উত্তরবঙ্গ প্রচার

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ এই বছরে অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের শিলিগুড়ি আশ্রম এবং দিনহাটায় ইহার নূতন কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

সেখানে তিনি শ্রীমন মহাপ্রভুর সার উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেনঃ

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবা

তিনি ব্যখ্যা করিয়াছিলেন যে 'জীবে দয়া' অর্থাৎ জীবকে শুদ্ধভক্তির পথে লইয়া আসা, 'নামে রুচি' অর্থাৎ নিরন্তর শ্রীহরিনাম জপ করা এবং 'বৈষ্ণব-সেবা' অর্থাৎ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের (শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবৎ-শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির সেবা, শ্রীধাম বাস ইত্যাদি) অনুশীলন করা । তিনি শ্রীমন মহাপ্রভুর রীতি শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে বিশেষ জোড় দিয়াছিলেনঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নবাব হুসেন শাহর প্রাচীন রাজধানী রামকেলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন যেখানে শ্রীমন মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতান গোস্বামী প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নবাবের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ যেখানে শ্রীমন মহাপ্রভু নির্ভয়ে বিশাল নগর সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেখানে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ভক্তবৃন্দ লইয়া গিয়াছিলেন।

বিবিধ সন্দেশ

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতীর ‘গঙ্গা সমগ্র যাত্রা’ অভিযানের সময় শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকার কোলকাতার রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিকে প্রচার করিয়াছিলেন যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে গভীর আগ্রহী ছিলেন।

‘জগদ্‌গুরু’

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

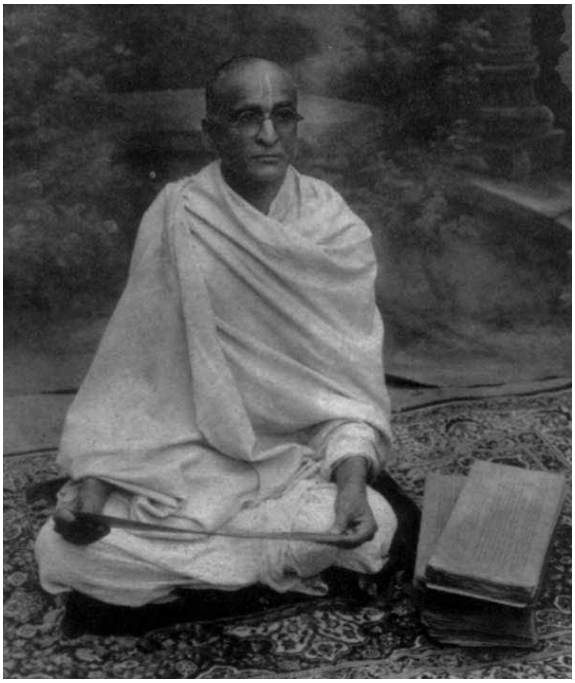

অগণিত “সাধারণ ভ্রমে”র মধ্যে ভগবদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত-সাহিত্যের পরিভাষা সমূহের অপব্যবহার অন্যতম এবং বর্তমান যুগের সংক্রামক অপরাধ। আমরা পূর্ব্বে “জয়ন্তী” শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষার ঐরূপ অপব্যবহার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছি। “জগদ্‌গুরু” শব্দটিরও সেরূপ যুগোচিত অপব্যবহার প্রতিপদেই পরিলক্ষিত হয়। নব্য অবতার-বাদের আখড়ার কল্যাণে আজকাল মর্ত্ত্যমানবকে—পাশব বলের দীপ্ত অহমিকার প্ররোচনাকারীকে সাত্বতশাস্ত্র পরিপন্থী মেয়েলি মনগড়া কথার ধূরবাহীর পদলেহীকে—আসুর প্রজোভাবের মূর্ত্ত মর্ত্ত্য প্রতীককে—শৃগাল-বাসুদেবের আদর্শানুকরণিককে যে সকল অবৈধ আনুকরণিক বিশেষণে রাস্তায় ঘাটে বিশেষিত করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হয়, তাহার সহিত “জগদ্‌গুরু” শব্দের বিদ্বদ-রাঢ়িবৃত্তি চিরদিনই স্বতন্ত্র। কর্মী জ্ঞানী যোগী, অন্যাভিলাষী, আনুকরণিক অদৈব প্রকৃতির লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণ কখনই জগদ্‌গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন না। মেয়েলি মনোধর্ম্মের কথায় বহির্মুখিগণ মনোরঞ্জনকারীকে বংশ দণ্ডের শীর্ষে পতাকা করিয়া তুলিলেই ঐরূপ মর্ত্ত্যমানব “জগদ্‌গুরু” র অসমোর্দ্ধ পদবী ও পরিভাষার অবৈধ দাবী করিতে পারে না। যিনি সাত্বত শাস্ত্রের অনুক্ষণ কীর্তনমুখে প্রচারকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি একায়ন কৃষ্ণ কীর্ত্তন ব্যতীত ভ্রমক্রমেও অন্য কোন কল্পিত উপায়-উপেয়ের স্বপ্ন দর্শন করেন না, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় অতিমর্ত্ত্য ভাব বিভাবের মূর্ত্ত প্রকাশবিগ্রহ, তিনিই জগদ্‌গুরু ; যিনি প্রেমপ্রচারক ও পাশণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নতনু, তিনিই জগদ্‌গুরু। যিনি স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তকুলের মূলোৎপাটনকারী, একায়ন কৃষ্ণভক্তিশিক্ষক, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি কীর্ত্তনৈকাস্ত্রের দ্বারা জগজ্জীবের মনোব্যাসঙ্গ ছিন্নকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি শতকরা শত পরিমাণে কৃষ্ণ ভজনের অকৈতব আদর্শে জগজ্জীবের সার্ব্বকালিকী সর্ব্বস্ব-সমর্পণময়ী হরিসেবার উদ্বোধনকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার প্রতি কার্য্য, প্রতি বিচার, প্রতি সিদ্ধান্ত, প্রতি কথা, প্রতি গমন, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুক্ষণ অকৈতব কৃষ্ণানুশীলন-প্রকটকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণী শ্রৌত সিদ্ধান্তের মৌলিক-গোমুখী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীর প্রতিপদে জীবন্ত শ্রীচৈতন্য মঠ প্রকটিত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীতে হরিসেবার পৌর্ণমাসী আবিষ্কৃত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু ; যাঁহার বাণীতে সনাতন-রূপের পদরজোভিষেক প্রবর্দ্ধিত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীতে শুদ্ধ আম্নায় তরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু। ভক্তি শাস্ত্রাচার্য্য মহর্ষি শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষিগণকে কি বলিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন—

বৈষ্ণব জ্ঞান বক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্‌গুরুম্।
পূজয়েদ্বাত্মনঃ কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥

শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥

অর্থাৎ “যিনি বিষ্ণু বিষয়ক দিব্য জ্ঞানের বক্তাকে বিষ্ণুতুল্য গুরুরূপে উপলব্ধি করেন এবং তাহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করেন, তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যিনি পাদশ্লোকের বক্তা, তিনিও সর্ব্বদা পূজ্য, আর যিনি ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্ব এবং তদ্ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য বিস্তার করেন, সেই জগদ্‌গুরুর কথা আর কি বলিব?”

আরও বলিতেছেন :-

নারায়ণং পরং ব্রহ্ম তজ্ জ্ঞানেনাথ গম্যতে।
জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্তাগম্॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তিরতো হেতো গুর্ব্বাধীনা সদৈব হি।
হেতনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্গুরুতরঃ স্মৃতঃ॥

যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্তময়ীং তনুম।
মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা॥

শাস্ত্রজ্ঞানেন যোহজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চবক্তি য়ঃ স জগদ্গুরু॥

"নারায়ণই পরব্রহ্ম - তাহা দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে অধিগত হয়। শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন, সেই শাস্ত্রও গুরুমুখগত; অর্থাৎ স্বকপোল কল্পিত বা নিজ বিদ্যা বুদ্ধির অধিগম্য নহে। কাজে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সর্বদাই গুরুর অধীন। এ জন্যই গুরু সর্ববাপেক্ষা প্রধানতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। জগন্নাথ শ্রী হরি শ্রী গুরুরূপা মানুষীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ হস্ত দ্বারা সংসার পতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যিনি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন এবং পরা শান্তিপ্রদ ভক্তিলক্ষণস্বরূপ শাস্ত্রের বক্তা, তিনিই জগদ্গুরু।"

একমাত্র ঐকান্তিক বিষ্ণু ভক্তোত্তম ব্যতীত অপর কেহই 'জগদ্গুরু' পদবাচ্য হইতে পারেন না, ইহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ করিয়া পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিয়াছেন –

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্যান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্ব দেবমিদং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্য এব স এব মম দুর্লভঃ॥
(আদিপুরাণ)

"হে কৌন্তেয়, বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর ; অন্য দেবতাকে কখনও ভজন করিও না। অর্থাৎ যে সকল দেবতার বৈষ্ণবাভিমান বা বৈষ্ণব পরিচয় নাই, তাঁহাদিগকে কখনও ভজনা করিও না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু " বিচারে যে শম্ভুর বৈষ্ণবাভিমান আছে, তাঁহাকেই জগদ্গুরু বিচারে আরাধনা করিবে। বৈষ্ণবেরাই নিখিল দেবতাগণের সহিত জগৎ পবিত্র করেন। যাহার সম্বন্ধে আমার ভক্ত প্রিয়, মৎ সম্বন্ধেও সেই ব্যাক্তি প্রিয়।"

তৎপরো দুল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বরম্।

সর্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
আত্মকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্॥

আত্মকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামী পার্থিব।

ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ।
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥
(আদিপুরাণ)

"হে ধনঞ্জয়, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি অতঃপর আর কি দুল্লভ হইতে পারে? ভক্তগণই নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তগনের গুরু। যেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তকূলের বান্ধব; ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগনের গুরু। হে অর্জ্জুন, ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। মুক্তিগণ শ্রুতিগণের সহিত ভক্তকূলের অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন, যাহারা কেবল আমার 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্ত পদবাচ্য নহে, আমার ভক্তগনের ভক্ত বলিয়া যাঁহাদের অভিমান তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। হে অর্জ্জুন, যাহারা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবাদি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকটই আমি সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত হইয়া আছি। ইহা ব্যতীত আমাকে ক্রয় করিবার অপরের সাধ্য নাই।"

দুরন্ত কলিকাল ! বহির্মুখতার তান্ডব ! শাস্ত্রের একায়ন পদ্ধতিতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুতর্কস্পৃহা জন্মাইয়া দিবার জন্য তথাকথিত সমন্বয়ের ধূয়া গান গাহিয়া এক শ্রেণীর কলির চর জগতে বিচরণ করিতেছে; আর বহির্মুখতার গনতন্ত্রের তন্ত্রীগুলির মধ্যে ঐরূপ সুরের সহজ স্পন্দন— ঐরূপ প্রতিধ্বনির প্রগতি সঞ্চার করিয়া জগজ্জঞ্জাল বাড়াইয়া তুলিতেছে ! ইহারই নাম নব্য 'সমন্বয়'!

ইহারই নাম আধুনিক সাম্যবাদ ! ইহারই নাম কল্পিত অসাম্প্রদায়িকতা ! ইহারই নাম বর্ত্তমান উদারতা !

ঐরূপ শ্রেণীর লোকের যুক্তি—"সাধুগণের শাস্ত্রে যখন সাধুর প্রশংসা, আবার চোরের শাস্ত্রে যখন চোরের প্রশংসা দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রে যখন সতীর প্রশংসা, আবার দুর্নীতির শাস্ত্রে যখন স্বর্বেশ্যাদির স্তুতিবাদ দৃষ্ট হয়, তখন সাধু ও চোর, সতী ও বেশ্যা সকলই সমান !! কেবল গোঁড়াগণই নিজের নিজের শাস্ত্রের কথা বড় বলেন। সাধুকে শ্রেষ্ঠ বলেন। সতীকে ভাল বলেন।"

ঐ শ্রেণীর লোকের যুক্তি—"প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শাস্ত্রেই স্ব-স্ব মতবাদকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য সেই মতবাদে আস্থা জন্মাইবার জন্য এবং লোকদিগকে স্বমতে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ অর্থবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় ! " অসদ্ব্যক্তিগন, চৌরগণ, বারবনিতাকূলের পক্ষাশ্রয়ীগণ এইরূপ একটা সন্দেহবাদের ইন্দ্রমায়াজাল অনভিজ্ঞ গনগড্ডলিকা ও তাহাদের ধূরবাহিনায়ককূলের সম্মুখে বিস্তার ব্যতীত আপাত আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় খুঁজিয়া পায় না। "সাধুগনের, সতীগনের যেরূপ প্রশংসাসূচক পুঁথি রহিয়াছে আমাদের, গুনগরিমার মহিমসূচক পুঁথিও সেইরূপই আছে "—ইহা যদি চৌর সম্প্রদায়—স্বৈরিণী-সম্প্রদায় না বলে তবে অসাধুত্ব ও অসতীত্ব সমর্থন বা সংরক্ষণ করিবার আর কী অস্ত্র বা কী যুক্তি থাকিবে?

"বিষ্ঠার কৃমিগণের নিকট বিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা, সর্বোচ্চ মাহাত্ম্য আছে; আর দেবতা-পূজকগণের নিকট চন্দনের প্রশংসা, চন্দনের শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রচারিত আছে; সুতরাং দেবতা পূজার চন্দনের মাহাত্ম্য কেবল অর্থবাদ! উহা কৃমিকাম্য বিষ্ঠারই সমকক্ষ ! দেবতা পূজার সম্ভার চন্দনকে কৃমির খাদ্য বিষ্ঠা হইতে 'শ্রেষ্ঠ' বলা গোঁড়ামি !! বা ক্ষুদ্রাধিকার !!!"—এইরূপ অসতী যুক্তি আজ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ধূয়াগানের মধ্য দিয়া বহির্ম্মুখ মানব মেধায় সঞ্চারিত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য ! তথাকথিত সমন্বয়বাদের পৃষ্ঠপোষক বা অবৈধ জনকস্বরূপ নির্ববিশেষবাদ বা সাধারণ কথার 'একাকারবাদ' কিংবা 'জগাখিচুড়িবাদে'র বিকৃত বৈদান্তিকব্রুবতার ছলনায় মূর্ত্ত বেদান্তবিরোধের মধ্য দিয়া, 'চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই সমান'—এইরূপ স্বকপোলকল্পিত, নাস্তিকতাপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের ছলনায় বাগ্‌বৈখরীতে অজ্ঞগণ-মেধাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া সাত্বতশাস্ত্রবিরোধ, একায়ন ভক্তিপথের বিরোধ, পূর্ণ অভিযান চলিয়াছে ! "শ্রীহরি-পূজার সম্ভার বা শ্রীহরি-নির্মাল্য চন্দনও বিষ্ঠা সমান"—ইহা নাস্তিক পাষণ্ডের কথা। ওহে ভোগিন্ , তোমার কামিনীর গাত্রে বা তোমার কুকুর-শৃগাল-ভক্ষদেহের অবৈধ প্রসাদনরূপে পরিণত চন্দন ও তোমার ভোগ্যসামগ্রীর বিকার বিষ্ঠা সমান হইতে পারে; ওহে 'ত্যাগি'-অভিমানী, প্রচ্ছন্নভোগিন্, পরমেশ্বরের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-সেবা-সম্ভার প্রভৃতিতে মায়াময়ী বুদ্ধিজাতা ও নাস্তিকতার চন্দনও বিষ্ঠার সমান হইতে পারে; কিন্তু যাহা হরিসম্বন্ধি বস্তু, যাহা হরিসেবাসম্ভার, সেই চন্দন কখনই তোমার ন্যায় মূর্খ, পাষণ্ড, চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর ডাঁশা অজ্ঞতা বা নাস্তিকতার কবলে কবলিত হইয়া বিষ্ঠার সহিত সমতা লাভ করিতে পারে না । যাহারা ঐরূপ নাস্তিকতাকে, পাষণ্ডতাকে 'ব্রহ্মজ্ঞান', আর ঐরূপ আচরণকারীর আদর্শ পুরুষকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' প্রভৃতি পদে পরিচিত করাইতে চাহে, তাহাদের বাক্য অশাস্ত্রীয়, তাহারা যমদণ্ড্য; তাহাদের আরাধ্য অভীষ্টগুলি যমদণ্ড্য—সুরবিরোধকূলের নায়ক-মাত্র । আমরা তো শাস্ত্রে দেখিতে পাই - শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞানীর উপমান স্বরূপ, চরম আদর্শ স্বরূপ শুক-সনকাদি ঋষিগণের ভগবচ্চরণারবিন্দের চন্দনমিশ্রিত তুলসীর গন্ধেই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপাক ও পরম ফলস্বরূপ কৃষ্ণ সেবার মহিমা প্রচারে রত হইয়াছিল। শুক-সনকাদির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানি-কুল-শিরোমণিগণ কোনও দিনই তো ঐরূপ চিজ্জড়সমন্বয়বাদের আদর্শ দেখান নাই। সুতরাং মনোধর্মজীবী নাস্তিক- কুলের সমন্বয় আসুরিক অভিচার মন্ত্রে গনতন্ত্র দীক্ষিত হইলেও আমরা সাত্বতশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া কখনই কৃষ্ণভোগ্য চন্দনকে কৃমি-কীটের ভোগ্য বিষ্ঠার সহিত এক বলিতে পারি না; সাত্বত শাস্ত্রে যে বিষ্ণু পূজা, বৈষ্ণব পূজার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত মিশ্র রজস্তমোগুণের অধিকারগণের জন্য লিখিত দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্যকে সমান আসন প্রদান করিতে পরি না; অমল পুরাণ, নির্গুণ শাস্ত্র পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সামান্য নীতিশাস্ত্র বা মিশ্র

সত্ত্বরজতমোগুনাধিকারযুক্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে কখনই 'এক' বলিতে পারি না। স্বৈরিণীর বাহ্যদেহ দর্শন, সূক্ষ্মদেহ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া, চেতন দর্শনে চিন্ময় স্বরুপকে কৃষ্ণদাস বলিয়া দন্ডবৎ করিতে পারি, তদ্রূপ মিশ্র সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাধিকার যুক্ত শাস্ত্রের তত্তৎ মিশ্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের একমাত্র একায়ন শ্রীকৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে প্রণাম করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের বাহ্য দর্শনকে কখনই আদর করিতে পারি না। চন্দনের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়। বিষ্ঠার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না—বিষ্ঠা বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণসেবা হয়। বিষ্ঠা কখনও অন্বয়ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। অসৎসঙ্গ কখনও অন্বয়ভাবে ভজনের অনুকূল হইতে পারে না—বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলে, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিলে ভজনের অনুকূলতা লাভ হয়। মায়া অন্বয় ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণসেবার অনুকূলতা করিতে পারে। সুতরাং মায়াকে ও কৃষ্ণকে একাকার করিয়া সমন্বয়বাদীর অশাস্ত্রীয় ধূরবহন করিতে পারি না। বৈষ্ণবকে সাত্বত শাস্ত্র, 'জগদ্গুরু' বলিয়াছেন বলিয়া নির্ভেদ জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী, ফলভোগী কর্ম্মী, অন্যাভিলাষী, ব্রতী, তপস্বীকে যদি তামস, রাজস শাস্ত্র-সমূহ আপেক্ষিক প্রশংসা করিয়াও থাকে, সেজন্য তাহারও অপ্রতিদ্বন্দী নিরপেক্ষ 'জগদ্গুরু' - ইহা কখনই বলিব না। কারণ, মলযুক্তের প্রশংসা ও নির্মলের প্রশংসা, মিশ্রগুণীর প্রশংসা আর অবমিশ্রগুণী বা নির্গুণের প্রশংসা কখনই এক নহে। এই সকল দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়া নাস্তিকতার বিষ-বাষ্প চিজ্জড়সমন্বয়বাদের কবল হইতে যিনি জগজ্জীবকে উদ্ধার করেন, সেই মদাচার্য্যই জগদাচার্য্য, সেই মদ্গুরুই 'জগদ্গুরু'।

শ্রীগুরুদেবে শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা কর্ত্তব্য, কোনটা অকর্ত্তব্য বুঝতে গিয়ে বড় বড় বিদ্বান্‌গণেরও মাথা ঘুরে যায় (কিং কর্ম কিম্ অকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ) মহা মহা মনীষিগণও তাঁদের প্রকৃত প্রয়োজনটা কি তা ঠিক করতে পরেন না। এই জড় জাগৎটা নানা জটিলতার একটা জঙ্গল, এখানে আত্মা নানা চেতনার সঙ্গে নানাবিধ দেহ ধারণ করছে। বিষ্ণুপুরাণে পাই,—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

জলচর জন্ম ন'লক্ষ, স্থাবর বা বৃক্ষ লতা বিশ লক্ষ, কীট ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী এগার লক্ষ, আকাশচর পক্ষী দশ লক্ষ, চতুষ্পদ, পশু ত্রিশ লক্ষ এবং মনুষ্য জন্ম চার লক্ষ। মনু বলেন, বক্ষ লতার প্রাণ থাকলেও তারা নিজকর্মের ফলস্বরূপ ঐ প্রকার অবস্থা লাভ করেছে। তাদের সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি আমাদের মতই। তাদের আত্মাও আমাদের আত্মার চেয়ে ন্যূন নয়। তথাপি তারা নিজ নিজ কর্মফলের দরুণ ঐ প্রকার শোচনীয় অবস্থা লাভ করেছে। এ জন্য অন্য কেউ-ই দায়ী নয়। বাহ্য জগতের ব্যাপার এই প্রকার।

আমরা এমনই একটা পরিস্থিতিতে বাস করছি, যেখানে কেবলই প্রচণ্ড ভ্রান্ত ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি, ভুলপথে চালিত হওয়া এবং অবিচার অত্যাচার ভরপুর রয়েছে। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটা ধরব কোনটা ছাড়ব, এসব কি করেই বা স্থির করব? কতরকম ঝামেলাএক সঙ্গে এসে আমাদের প্রভাবিত করতে আসে। যখন এই প্রকার মায়াজালে পড়ে আমরা নানবিধ বিপরীত পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন অনন্ত বৈকুণ্ঠ জগতের সাধনপথ পাওয়ার আশা আমরা কেমন করেই বা করতে পারব ! যে চিন্ময় জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত আধোক্ষজ, সেই জগতে যেতে হলে আমাদের দৃষ্টিকোণ কি প্রকার হওয়া দরকার—এই সব চিন্তার বিষয়।

প্রকৃত গুরু

সেই জগতে, সেই চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সাহায্য করতে পারে, এমন কোন পথ বা সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের অন্তরের আশাবন্ধের অনুকূল একটু সম্বন্ধ পেলেই তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ, আমরা ত' একান্তই সহায়-সম্বলহীন, একান্ত অসহায়, নৈরাশ্য সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, সমূহ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের নিজস্ব সম্বল, বুদ্ধি-বিচার, প্রকৃত কাল্যাণ কিসে হয়, তা বুঝে নেওয়ার জ্ঞান, এত অকিঞ্চিৎকর, এত সামান্য যে, তার উপর আমরা ভরসাই করতে পারি না। সবই ত' দেখছি, চারদিকেই বিপদ ! এ অবস্থায় একজন প্রকৃত পথ-প্রদর্শক, প্রকৃত গুরুর আবশ্যকতা যে কত, তা আমাদের অনুভব করা দরকার।

আমরা এমন একটি অবস্থার মধ্যে পড়েছি, যেখানে নানা প্রকার শক্তি আমাদের নিরন্তর নানা দিকে আকর্ষণ করে চলেছে। তাই একজন শক্তিমান ব্যক্তির আনুগত্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সকলের সব রকম নির্দ্দেশ মেনে চলা কঠিন। তাই প্রকৃত নির্দ্দেশটা কি, তা জানবার প্রযত্ন আমাদের নিতান্তই আবশ্যক সেই প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেই দিয়েছেন, —

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

পরমার্থ জগতের জ্ঞানলাভের জন্য আত্মজ্ঞানলব্ধ সদ্‌গুরুর সমীপে যেতে হবে, নিজের ইষ্টদেব রূপে তাঁর চরণে

শরণাগত হতে হবে। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা তাঁর সন্তোষ বিধান করতে হবে। সেই তত্ত্বদর্শী স্নিগ্ধ শিষ্যেয় হৃদয়ে আত্মজ্ঞান সঞ্চার করেন; কারণ তিনি সত্যদ্রষ্টা।

শিষ্যের যোগ্যতা

এই সংসারে কৃষ্ণ সাধু গুরু দ্বারা আমাদের হাতে একটি মাপকাঠি ধরে দিয়েছেন, যার সাহায্যে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, তা আমরা ঠিক করে নিতে পারি। এই যে মাপকাঠি তা কোনও দূষিত ভূমিকা থেকে এলে চলবে না। তা অপ্রাকৃত ভূমিকা থেকে আসা চাই, এবং তার অনুভূতির জন্য আমরা যারা শিষ্য হতে চাই, তাদের তিনটি যোগ্যতা চাই, তাহল—প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা।

প্রণিপাত অর্থ আমরা সেই জ্ঞানের নিকট নিজেকে সমর্পণ করে দেবো, তার কাছে সম্পূর্ণ প্রণত হয়ে যাবো, কারণ তা সাধারণ জাগতিক অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নয়; তাকে আমরা জ্ঞাতা হয়ে আমাদের জ্ঞাতব্য বস্তু রূপে গ্রহণ করে নিতে পারি না। সেই জ্ঞান অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের, বুদ্ধির বা মেধার বিষয় বস্তু হতে পারে না। আমরা এই জগতের জ্ঞাতা হতে পারি, কিন্তু সেই পরজগতের জ্ঞানের নিকট আমরা নিজেকে জ্ঞাতা না হয়ে জ্ঞাতব্য রূপে সমর্পণ করে দিতে হবে।

'প্রণিপাত' শব্দের আরও অর্থ হচ্ছে, শিষ্য গুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে বলে, এই জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আমি জর্জ্জরিত হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছি, এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই, কোন কিছুই আমার ভাল লাগে না, আমি এখন আপনার শ্রীচরণে নিজেকে অর্পণ করে দিলাম, আপনার কৃপা আমার চাইই। এই প্রকার মনোভাব নিয়েই আমরা সেই অধোক্ষজ জ্ঞান লাভের অধিকার পেতে পারি।

'পরিপ্রশ্ন' অর্থ আন্তরিক নিষ্কপট জিজ্ঞাসা, আমরা কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি, সাধারণ আলোচনা বা কেবল তর্ক করার মনোভাব নিয়ে যে প্রশ্ন করি তা এই শাস্ত্রীয় পরিভাষার পরিপ্রশ্ন নয়। আমাদের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা মনোভাব না রেখে কেবল মাত্র বাস্তব সত্যকে অনুভব করা, যথার্থ মার্গের প্রতি আমাদের যাবতীয় প্রযত্ন কেন্দ্রীভূত হওয়া দরকার। আমাদের সমগ্র সত্তা ও একাগ্রতা দিয়ে সেই সত্যকে অনুভবের মধ্যে আনতে হবে কারণ সেই সত্য

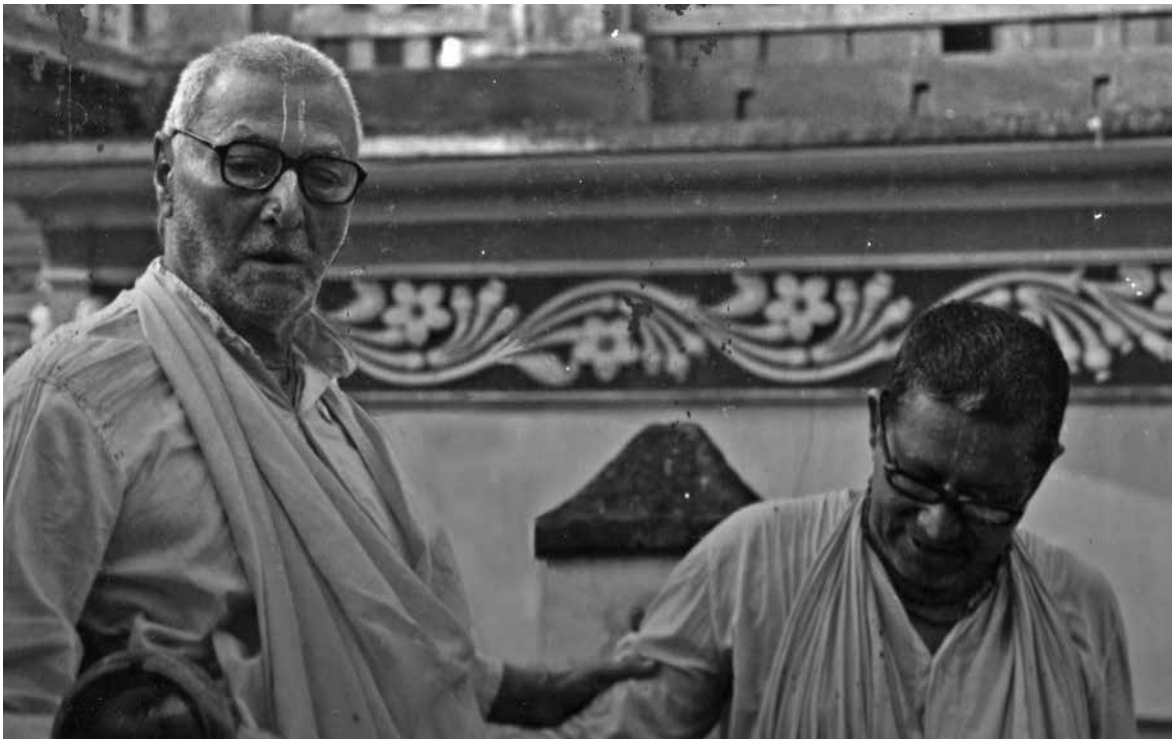

এমন একটা ভূমিকা থেকে কৃপা করে অবতরণ করবেন, যে ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের পূর্বের কোন ধারণাই নাই।

শেষের কথা, 'সেবয়া' অর্থ সেবা। এইটিই সবচেয়ে মুখ্য। আমরা এই যে জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি, তাকে এই জগতের কোন কাজে লাগাবার জন্য নয়। এই জগতে আমরা যে ভালোভাবামবে করবো এই জন্যও নয়, পরন্তু যাতে আমরা এই জগৎ ছেড়ে সেই জগতের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি তার জন্যই। এই রকম বিচার ধারা ও মনোবৃত্তির দ্বারাই আমরা ঐ জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছাতে পারি। আমরা সেই দিব্যজ্ঞানের সবা করব। তাকে আমাদের সেবায় লাগাবার জন্যে কখনই চেষ্টা করব না। কারণ এই রকম প্রবৃত্তি থাকলে আমরা সে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না। অধোক্ষজ জ্ঞান এই নিম্ন ভূমিকায় সেবা করার জন্য কখনই নেমে আসবে না। আমরা নিজেকে তার সেবার জন্যে অর্পণ করলেই তার কৃপা পাওয়া যাবে। আমাদের নিজের স্বার্থ বা নিজের জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হবে না।

কেবল সেবা মনোভাব নিয়েই নিশ্চয়ই আমরা তাঁর সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। তিনি আমাদের পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবেন এমনটি কখনও চিন্তা করা উচিত নয়, এই সেবা প্রবৃত্তির দ্বারাই আমাদের যথার্থ বোধশক্তির উদ্রেক হবে; তার পরেই আমরা কোনটা কি, তা ঠিক ভাবে জানতে পারব এবং আমাদের চারিদিকের প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিতে পারব।

এইটাই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি। অদ্বয় জ্ঞান এইভাবেই শিষ্যপরম্পরায় নেমে এসেছে। কোন জাগতিক জ্ঞানপন্থার মাধ্যমে তা লাভ করা যাবে না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এ বিষয়ে মৌমাছির উপমা দিতেন। কাচের বোতলে মধু রয়েছে, বোতলের ছিপিটাও ভাল করে আটা আছে। মৌমাছি কাচের বোতলের উপর বসে মৌ ছাখ্‌বার জন্য বোতলটাকে চাট্‌ছে কিন্তু বোতলটাকে চেটে যেমন মৌমাছি মৌ খেতে পারে না, সেই রকমই জড় জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা পরাবিদ্যার রস আস্বাদন করা যেতে পারে না, সে জগতে ঐ ভাবে যাওয়া যেতে পারে না। আমরা কেবল মনে মনে চিন্তা করতে পারি যে, আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি, সেই জ্ঞান পেয়ে গেছি কিন্তু বাস্তবে তা নয়। মাঝখানে বাধা আছে, কাচের বোতলটা রেয়েছে। প্রাকৃত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরমার্থ জগতের অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'।

কেবলমাত্র বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আন্তরিক সমর্পণ বা আত্মনিবেদনের দ্বারাই সেই জগতে প্রবেশের জন্য ভিসা বা প্রবেশপত্র পাওয়া যায়, তা আবার সে জগতের ব্যক্তিই কৃপা করে দেবেন, তবে সেই চিৎধামের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব।

সুতরাং সেই চিন্ময় ধামে যাওয়ার জন্য শিষ্যের পক্ষে এই তিনটি যোগ্যতা থাকা দরকার—Humility, Sincerity, and Dedication সঙ্গত বিনয়, আন্তরিকতা বা নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন; এই তিনটির দ্বারা গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যায় এবং সেই কৃপার ফলে গোলোক বা চিৎজগতে প্রবেশের আধিকার হয়। এই সব কথা বেদ, উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, উপনিষদ বলেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"

"গুরুদেবের কাছে যাও, মনে কোন দ্বিধা নিয়ে নয়, কেবল ঐকান্তিক আগ্রহ ও সরল হৃদয় নিয়ে যাও।"

পরমার্থপথের যাত্রা—কেবল যাওয়ার টিকেট্

রিটার্ণ টিকেট কেটে গুরুর কাছে যাওয়া যায় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রায়ই বলতেন "তোমারা ত' রিটার্ণ টিকেট্ কেটে এসেছ।" এই মনোভাব অর্থৎ পূর্ব থেকেই ফিরে আসার পাকা বন্দোবস্ত করে গুরুর কাছে যাওয়া যায় না। আমাদের ভেবে নেওয়া দরকার যে, আমরা এজগতের যা কিছু জেনেছি, পেয়েছি, তার প্রকৃত স্বরূপটা যে কি, তা জানা হল, এখান থেকে আর কিছু পাওয়ার নাই, যা হয়েছে, তা যথেষ্ট, এই বিচার নিয়ে গুরুদেবের কাছে যাওয়া চাই। জগতে বেঁচে থাকতে হলে তার এই একটি মাত্র উপায়।

এই জগৎটা মরণশীল, এখানে বেঁচে থাকার মতো অন্য কোন উপায় নেই। অথচ বাঁচার জন্য সকলের মধ্যেই একটা প্রবল ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আছে, "আমি বাঁচতে চাই ও

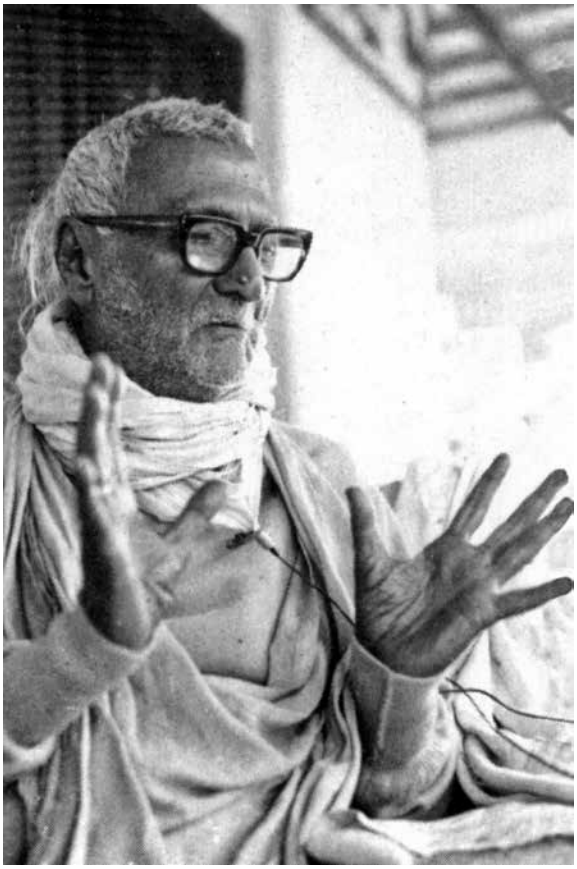

নিজেকে রক্ষা করতে চাই, সেই জন্য আমি প্রকৃত আশ্রয় দাতার কাছে ছুটি যাচ্ছি"—এই প্রকার আগ্রহ নিয়ে শিষ্য গুরুর কাছে যাবে এবং গুরুর সেবার জন্য তার মধ্যে যা রয়েছে সে সব নিয়েই সে গুরুকে আশ্রয় করবে। এমন নয় যে, সে গুরুর শিষ্য হয়ে তাঁকে দয়া করছে বা গুরুর নাম-যশ বাড়াবার জন্য সে শিষ্যত্ব স্বীকার করেছে।

এতো গেল শিষ্যের কথা। এখন গুরুর আসন কেমন তা জানা দরকার। গুরুর মধ্যে কেবল শাত্রে জ্ঞান থাকলে হবে না। তাকে শাস্ত্র বাক্যে নিষ্ণাত হতে হবে অর্থৎ শাস্ত্রের বাক্য তাঁর অনুভূতির মধ্যে আসা চাই। পৃথিবীতে কত লোক শাস্ত্রের কতরকম বাখ্যাই না করছে। শ্রীগুরু সেই সব শাস্ত্রজ্ঞান তার আচরণের মাধ্যামে জগতে বিস্তার করবেন অর্থাৎ তার সমগ্র জীবন যাপন প্রণালীটাই শাস্ত্রবচন রূপে প্রকাশ পাবে। তার যাবতীয় কর্ম জগতের সঙ্গে নয়,তা পরমব্রহ্মের সঙ্গে, যে পরমব্রহ্ম এই সমগ্র সৃষ্টিকে ধরে রেখেছে, যে পরমব্রহ্ম সমস্ত সৃষ্টির মূলাধার, সেই ব্রহ্মতে গুরু পরিনিষ্ঠিত হয়েছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠম্ গুরুর জীবনটা অন্য যে কোন জড় জগতের প্রাণ বা মানুষের মতো নয়। তিনি এই জড় জগতে থেকেও অপ্রাকৃত কগতের সঙ্গে সর্বদা যোগযুক্ত। তিনি যা কিছুই করেন সেই চিন্ময় চেতনার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েই করে থাকেন। এইটিই হলো উপনিষদের অন্তরনিহিত অর্থ। আর শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে,—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

মায়ার অর্থ বিভ্রান্তি আমরা সকলেই এই ভ্রান্তির মধ্যেই বাস করছি। পরতত্ত্বের সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নাই। যা আছে, সে সবই উল্টো, কেবল অপস্বার্থপরতা আর বিভ্রান্তির দ্বারা আমাদের মন-বুদ্ধি আচ্ছন্ন। যখন আমরা অনুভব করি,—আমাদের চারদিকে যা দেখেছি, সে সবই ক্ষণস্থায়ী, একদিন সবই শূন্য হয়ে যাবে, তখনই আমরা পরমার্থপথের দিগ্দর্শক শ্রীগুরুদেবের কাছে যাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হই। তখনই প্রশ্ন আসে—"আমার সবচেয়ে ভাল কিসে হবে?" এই প্রকার জিজ্ঞাসা নিয়েই সদ্গুরুর কাছে যেতে হয়।

কি প্রকার গুরুর কাছে যাব ? যিনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী নন, অধিকন্তু তাঁর পরত্ত্বের অনুভূতি আছে। তাঁর মধ্যে পরতত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে, শাস্ত্রের মর্ম কি তা যিনি জানেন, আবার তাঁর জীবনে, তাঁর আচরণে শাস্ত্রবাণী মূর্ত্তবিগ্রহ ধারণ করেছে, যিনি কৃষ্ণচেতনায় নিষ্ণাত, তিনিই যথার্থ গুরু। সুতরাং প্রকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ কি, তা কি করে লাভ করা যায়, তার জন্য সেই প্রকার গুরুকেই আশ্রয় করতে হবে, তা না হলে আমরা ভুল পথে চলে যেতে পারি। তাতে যখন কোন ফল পাই না, তখন মনে করি-"এখানে কিছুই নাই, এ ঠিক নয়।" তাই প্রকৃত পন্থা আশ্রয় করে সাধন করলে আমরা পরতত্ত্বের বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব।

শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ইংরেজীতে রচিত এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় "দি হার্‌মোনিস্‌ট্‌" পত্রিকায়, ১৯৩৪ সালে।

ভুল করা হল মানবপ্রকৃতি। সকলেই আমরা কোন না কোন সময় ভুল করব বা বিপথগামী হব, এ আমাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কারণ আমরা এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করিনি। তবুও আমরা কেউই অপরিপূর্ণ হয়ে থাকতে চাই না। সকল জীবসত্ত্বার মধ্যে এমন একটি গুণ আছে যার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে পরিপূর্ণতা লাভ করার দিকে। তা যদি না হত তাহলে আমরা কখনও কোন অভাব অনুভব করতাম না। পরিপূর্ণতা লাভ করার দিকে আমাদের এই যে প্রবণতা তা নিশ্চয়ই খুব দুর্বল ও সীমিত; তা না হলে আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারতাম। পরিপূর্ণতা লাভ করার পথে আমাদের ক্ষমতা ও প্রবণতা যে সীমিত সেই কারণেই আমাদের জীবনে গুরুর বা পথনির্দ্দেশকের প্রয়োজন আছে।

যে অপরিপূর্ণ সে অপরিপূর্ণ হত না, যদি তার সাহায্যের দরকার না থাকত এবং এই সাহায্য তাকে অবশ্যই বাইরে থেকে পেতে হবে। যিনি পরিপূর্ণ তাঁকেও পরিপূর্ণ বলা যায় না যদি তিনি নিজেকে প্রকাশিত করতে না পারেন এবং অন্যকে সাহায্য করতে না পারেন এবং সেটাও তাঁর স্ব-ইচ্ছায়। সুতরাং যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা ভগবৎস্বরূপ তাঁর দিকে পৌছবার পথনির্দ্দেশনা করাটাও তাঁরই একটি স্বাভাবিক ধর্ম বা ক্রিয়া এবং তাঁর যে দিব্য প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর এই ক্রিয়া সম্পন্ন বা প্রকাশিত হয় তিনিই হলেন শ্রীগুরুদেব বা আমাদের জীবনের দিব্য পথনির্দ্দেশক।

যিনি পরমসত্যের বা ভগবৎস্বরূপের অনুসন্ধান করছেন, তাঁর পক্ষে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক ধরণের চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা মনে করেন আমাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা যখন সম্ভব তখন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক জ্ঞানই বা কেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমাদেরই ভেতর থেকে প্রকাশ পাবে না বা বিবির্তত হবে না। এই ধরণের লোকদের—যিনি পরমজ্ঞান ও পরমজ্ঞেয়, সেই ভগবৎস্বরূপের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলা যেতে পারে, কারণ তাঁরা জানেন না যে একমাত্র তিনিই হলেন পরমকর্ত্তা এবং আর সবকিছুই ও আমরা সকলেই তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টির সামনে তাঁর ইচ্ছার নিমিত্ত মাত্র হয়ে অবস্থান করছি। চোখের পক্ষে মনকে দেখা অসম্ভব, তখনই চোখের মনের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, যখন মন তার দিকে মন দেবে। সেই একই ভাবে ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠাটাও তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেজন্যে আমাদের অবশ্যই ঐকান্তিক ভাবে তাঁরই প্রতিনিধির বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকের (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের) উপর নির্ভর করতে হবে যাঁর মধ্যে দিয়ে শ্রীভগবন্‌ নিজেকে বিতরণ করতে চান।

যিনি চিরগতিশীল অসীম সত্ত্বা, তাঁর মধ্যে আমাদের এই মানবসমাজ তাঁর সর্বোত্তম সংস্কৃতি নিয়েই এক অতি ক্ষুদ্র

স্থান অধিকার করে আছে। তাই আমরা কি করে আশা করতে পারি যে কোন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট দিব্যপ্রকাশের মাধ্যম ছাড়া, যিনি অসীম ও অধোক্ষজ, তাঁর সম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞানের উপলব্ধি বা ধারণা আমাদের হতে পারে ? যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ, তাঁর সামনে বিরাট বুদ্ধিজীবি পণ্ডিতদেরও পিগ্ মীর মত ক্ষুদ্র মনে হবে, কারণ তাঁকে বিতরণ করার অধিকার কেবল তাঁরই আছে এবং সেটা তিনি কেবল তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধিদের মধ্যে দিয়েই করেন।

তবে আমাদের জ্ঞান ও নিষ্ঠা দিয়ে যতটা সম্ভব আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন আমারা কোন মেকী গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ না করি। অবশ্য এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের খুব বেশী সাহায্য করতে পারি না, কারণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা প্রধানতঃ আমাদের পূর্ব সংস্কার দ্বারা চালিত হচ্ছি। (ইংরিজিতে একটা কথা আছে) "এক জাতের পাখীরা একই সঙ্গে ঝাঁক বাঁধবে" (অর্থাৎ আমাদের পূর্বসংস্কার অনুযায়ীই আমরা কারোর প্রতি আকৃষ্ট হব বা হব না)। যদিও সাধারণতঃ আমরা অভ্যাসেরই অধীন, তবুও আমাদের এই মানবজন্মে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামতও কিছুটা কাজ করে, তা না হলে আমাদের শোধন করাটা অসম্ভব হত এবং সে ক্ষেত্রে দণ্ড দেওয়াটা কেবল প্রতিহিংসার কাজ হত। যিনি পরমসত্য তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকশিত করতে পারেন। আলো তার স্বরূপ প্রমাণ করার জন্যে অন্ধকারের উপর নির্ভর করে না। সূর্য নিজে নিজেই আর সব আলোর চেয়ে নিজের উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারে। যাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ, তাঁর সামনে অন্য সব জাগতিক নিয়মের শিক্ষাদাতাদের ম্লান করে দিয়ে সদ্গুরুর স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়।

শ্রীগুরুদেব নিজেকে দুভাবে প্রকাশিত করেন—অন্তরে তিনি নির্দ্দেশক (চৈত্ত্য গুরু) হয়ে আর বাইরে তিনি উপদেশক হয়ে বিরাজ করেন। পরমেশ্বরের এই দুইরকমের ক্রিয়াই জীবত্মাকে বা সদ্গুরুর শিষ্যকে সাহায্য করে তার চরম লক্ষ্যে পৌছতে। অন্তরে অবস্থিত নির্দ্দেশক (চৈত্ত্য গুরু) হয়ে আমাদের যে প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ দেন, তা আমাদের পতিত অবস্থায় আমরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তাই করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ যে উপদেশক, শ্রীগুরুদেব হয়ে বাইরে বিরাজ করছেন তিনিই আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসা। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও ঠিক যে চৈত্ত্য গুরুর কৃপাতেই যে সদ্গুরু বাইরে বিরাজ করেন তাঁকে আমরা চিনতে পারি ও তাঁর পবিত্র পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে পারি।

যে প্রকৃত শিষ্য সে সর্বদাই এই তথ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবে যে তার যে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদ সে কেবল পরমেশ্বরের কৃপার দান মাত্র এবং এটা কোন অধিকারের ব্যাপার নয় যেটা দাবী করা যায় বা জিতে নেওয়া যায়। আমাদের সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা কেবল শ্রীভগবানের কৃপার দান গ্রহণে সমর্থ। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করা উচিত, সেটা হল জীবাত্মা কখনও পরমপুরুষের সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে এক হতে পারে না। জীবাত্মা তার মুক্ত বা সিদ্ধ অবস্থাতেও কখনও ভগবৎস্বরূপের সমান বা তাঁর সঙ্গে একাত্মা হতে পারে না। শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর সচ্চিদানন্দময় ধামের দিব্যজ্যোতির যে পার্থক্যটা আছে সেটা ভুলে যাওয়ার অজ্ঞান তামসিকতার থেকেই এই ভুল ধারণাটার প্রবর্ত্তন হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা কেবল শ্রীভগবানের এমন একটা শক্তির (তটস্থা শক্তি) অংশ যেটা তাঁর একটা মধ্যম মানের শক্তি (অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বোচ্চ আর বহিরঙ্গা শক্তি সর্বনিম্ন মানের শক্তি)। সেজন্য জীবাত্মা দুদিক (অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ ও প্রাকৃত জগৎ—এই দুদিক) থেকেই প্রভাবিত হতে পারে। ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে জীবাত্মার গুণগত ও পরিমানগত দুরকমের পার্থক্যই আছে এবং তাঁর উপরে সে নিতান্তভাবেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রভু আর জীবাত্মা তার স্বাভাবিক প্রকৃতিবশেই তাঁর অনুগত সেবক।

এই যে সম্বন্ধ এ হল নিত্য এবং জীবাত্মার পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক ও পুষ্টিকর। ক্রীতদাসত্বের আশংকা এই সম্বন্ধের মধ্যে আসে না কারণ এর মধ্যে রয়েছে জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছা ও তার পরম লাভ। পরম মঙ্গলময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলে শুধু যে জীবাত্মার স্বাধীনতাও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের হানি হয় না তাই নয়, পরন্তু একমাত্র তাঁর মধ্যেই এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব সত্যিকারের সমৃদ্ধি লাভ

করে। যেখানেই শ্রীভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেখানেই জীবাত্মার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিজস্ব অধিকারও সেই সম্পর্কের অপরিহার্য্য অঙ্গ রূপে আছে। তাই মাছ যেমন জলে আর পশু যেমন বনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তেমনি সেই জীবাত্মারাও সেই সম্পর্কের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দে থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবানের যে স্বাধীনতা ও অন্যান্য গুণ আছে তা হল অপরিমিত ও অপ্রাকৃত এবং তার সেই অপরিমিত শক্তির কেবল আংশিক ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি সমস্ত জীবজগতের সমন্বয় সাধন করেন।

শ্রীগুরুদেব সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের সমান নন। কিন্তু তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণসত্ত্বা ও তাঁর শক্তির সারাংশের ও তাঁর সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম সেবার ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি। যেহেতু তিনি শ্রীভগবানের সবচেয়ে যোগ্য সেবক তাই শ্রীভগবান তাঁকে বিশেষ শক্তি দিয়েছেন সমস্ত বিপথগামী জীবকে তাদের সর্বোত্তম স্বার্থের সন্ধান দিতে। এই মৃত্যুময় ও দুঃখময় পৃথিবীতে অমৃতময় আশা ও আনন্দের দিব্যদূত হলেন শ্রীগুরুদেব। তাপিত, পীড়িত জনগণের জন্য তাঁর আবির্ভাবই সবচেয়ে শুভ ও আনন্দদায়ক ঘটনা। এর তুলনা হতে পারে একমাত্র প্রভাতের শুকতারার সঙ্গে, যা কিনা মরুভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রীকেও পথ দেখাতে পারে। শ্রীগুরুদেবের করুণাময় হস্তের কোমল স্পর্শই সমস্ত অশ্রুপ্লাবিত নয়নের অবিরাম অশ্রুকে মুছিয়ে দিতে পারে। দেশপ্রেমিকরা বা সমাজসেবকরা তাদের প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াসের দ্বারা কেবল পীড়িত মানুষের গভীর সমস্যাকে আরও ঘণীভূত করে তোলে, যেমন অজ্ঞ চিকিৎসক দুর্ভাগা রোগীর চিকিৎসা করেন। আহা, সেইদিন কবে আসবে যেদিন এই দুর্ভাগা জীব শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

শ্রীগুরুপূজা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

সমস্ত শাস্ত্রাদিতে শ্রীগুরুদেবকে 'অভিন্ন ভগবৎস্বরূপ' বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ভগবান যখন দুঃস্থ জীবগনকে কৃপা করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে আমাদের সম্মুখীন হন, তখনই আমরা তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হই।

আমরা অত্যন্ত দুঃস্থ জীব। আমাদের স্বরূপ বিস্মৃতি এত প্রবল যে, বিরূপের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কার্য্যকলাপে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াও তাহার মোহ কাটাইয়া একটু নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি না। এই হাড় মাংসের থলি দেহটার সম্পর্কে আমরা এত বেশী অভিনিবিষ্ট যে ইহার সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অবস্থিতি আমাদের ধারণায় আসে না। এবং সেইজন্যই আমাদের তদ্ব্যতিরেক চিন্তার উদয় হয় না।

এরকম কেন হইল ? কেন আমরা এইপ্রকার সংসার যন্ত্রণা-নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, কেন আমরা দিবারাত্র— উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও নিজেকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছি না, কেন আমাদের সুখের জন্য এতটা প্রযত্ন নিষ্ফল হইতেছে, কেন আমার চতুর্দ্দিকে শুধু এই নিরানন্দেরই আস্ফালন, কেন আমারই মত দুঃস্থ জীবগণের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের যবনিকাপাত হয় না, কেন—কেন এই জগতের স্থূলধারা এত নির্মমভাবে সমস্ত জীবজগৎকে নিষ্পেষণ করিতেছে— ইহার কারণ আমরা একটিবারও স্থিরচিত্তে অনুসন্ধান করিতে পারি কি? তবে কেনই বা পারি না ?

আমরা দুর্ভাগা। 'ভূতে পশ্যন্তি 'বর্ব্বরাঃ'। আমরা শুধু দুর্ভাগাই নহি পরন্তু নিমকহারামও বটে। কথায় বলে 'নুন খায় যার, গুণ গায় তার' কিন্তু আমরা নুন খাই একের, আর গুণ গাই অপরের। অতএব সত্যই নিমকহারাম।

সর্বশাস্ত্রের নির্যাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি-ভেদাভেদ প্রকাশ॥

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

ভেবে দেখুন মায়া দেবীর কি মারাত্মক কর্মসূচী এবং কি প্রচণ্ড প্রতাপ। কিন্তু এ ব্যাপারে দোষ কি তাঁর ? আরও পরিষ্কার হবে নিচের পয়ারে—

কৃষ্ণভুলি সেই জীব ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেভাব উদয়॥"

অর্থাৎ দোষ জীবের নিজেরই। তবে মনে হয় মতিচ্ছন্ন হয়েছে পিশাচী পাওয়ার আগে হতেই, নতুবা পরিশুদ্ধ জীবকে স্পর্শ করিবার সাধ্য কোথায় ? তাই সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥"

ভগবান বৃহচ্চিদ্বস্তু। শুধু চিদ্বস্তুই নন, তিনি সচ্চিদানন্দময়। সৎ অর্থাৎ নিত্য, চিৎ—জ্ঞান, ও আনন্দ

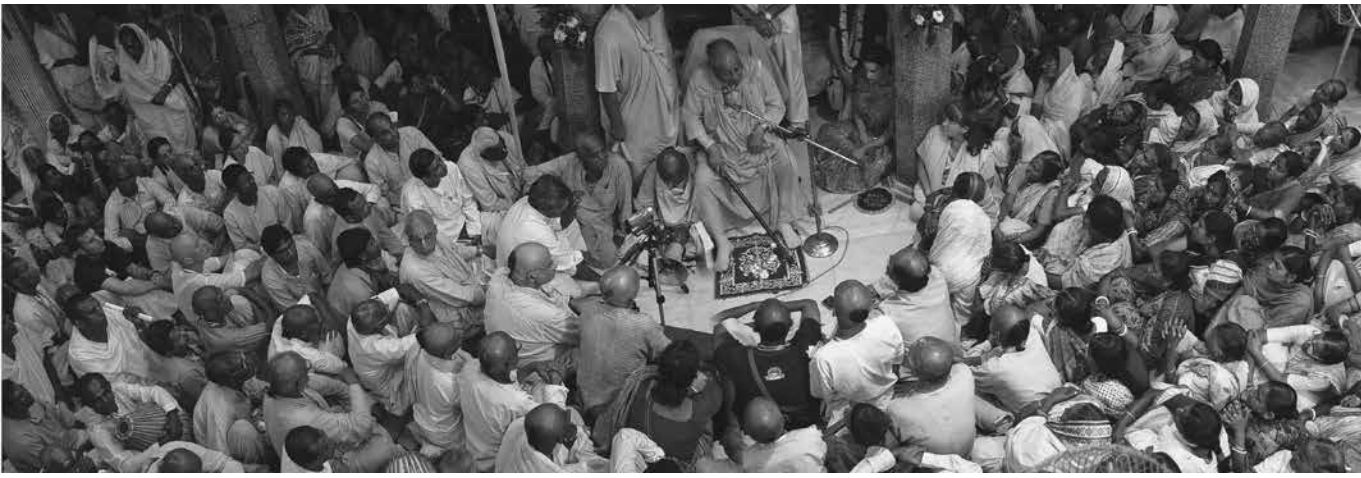

সুখ স্বরূপ—রসসমুদ্র । শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভাষায় অখিলরসামৃতমূর্ত্তি । জীবও—নিত্য, অনু-চিদানন্দময়। সেবাসুখ-সম্পদের অধিকারী। শ্রীভগবৎসেবাই তাহার নিজ নিত্যস্বরূপের ধর্ম্ম । কিন্তু তটস্থভাবে অবস্থিতিতে স্বতন্ত্রের অপব্যবহার করার ফলে সে কর্তব্যচ্যুত-ধর্মচ্যুত । ভগবতসেবার অর্থাৎ আনন্দময়ের—সুখময়ের সেবানন্দের পরিবর্তে, অর্থাৎ স্বরূপধর্মের পরিবর্তে সে যখনই নিজের ভোগানুসন্ধানপর হইয়াছে, তখনই মায়াদেবী তাহার গলায় ফাঁস পড়াইয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আর তখন হইতেই ভগবদ্বিস্মৃতি ফল লাভ করিয়া জীব—"মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে"—ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছে। যতই ঐভাবে তার ভোগানুসন্ধান বাড়িতেছে, ততই সে অনবরত মায়ার কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। "এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডভরি অনন্ত-জীবগণ। চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।"

কিন্তু এই অবস্থার অবসান কি করিয়া সম্ভব— শুধু তাই নয় কিভাবে পূর্বাবস্থা লাভ হয়, এখন তাহাই বলিতেছি। "সাধু-গুরু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥" এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ একমাত্র মায়াধীশের কৃপাতেই সম্ভব।

মায়াধীশ ভগবান মঙ্গলময়—বড় করুণাময়। তাই তিনি জীবের ঐপ্রকার অমঙ্গলময়—অপরাধময়—দুঃখময় জীবন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, স্থির থাকিতে পারেন না। তাই মাঝে মাঝে আমাদের মত হইয়া এই বদ্ধভূমিতে আসিতে বাধ্য হন । এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবান তো সর্বশক্তিমান, অতএব তাঁহার আসিবার প্রয়োজন কি ? তিনি তো ইচ্ছা করিলেই সকলে উদ্ধার পাইতে পারে ? উত্তর এই যে- তিনি জীবকে যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, তাহার উপর বলপ্রয়োগ করেন না— ইহাই তাঁহার সাধারণ নিয়ম । স্বতন্ত্রতা এই জন্য—জীব

বিচিত্র সেবা-সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারিবে বলিয়া। আর পনের আনা তিন পয়সা জীবই সে সুযোগে ধন্য হয়। যাক্ এখন বাকী একপয়সার কথাই বলি। কারুণ্যগুণস্নিগ্ধ ভগবান তাই আমাদের মত হইয়া আসেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির সমস্ত উপায় নিজে আচরণমুখে সকলকে শিক্ষা প্রদান করেন। এইখানেই আমরা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গুরুদেবতাত্মরূপে ভগবচ্চরণে অর্পিত হইতে পারি, অবশ্য ইহাও ভাগ্যবান্ জীবের প্রাপ্তি-যোগ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥" অবশেষে "কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।" ইহাই শ্রীগুরুদেবের বাহ্যপরিচয়।

বস্তুতঃ শ্রীগুরুকৃপাভিন্ন জীব কোনপ্রকার সুমঙ্গলই লাভ করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীগুরুদেবের স্থান 'বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি'। এইজন্য ভগবৎপূজার প্রথমে শ্রীগুরুপূজার নিয়ম বিধিবদ্ধ। এইজন্যই হরি রুষ্ট হইলেও গুরুদেবের রক্ষা সামর্থ্য শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমরা এমনই বিমুখ যে, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া কেবলই অপরাধের বোঝা বাড়াইয়া চলিতেছি। ভগবানের সতর্কবাণীতে পর্য্যন্ত খেয়াল আসিতেছে না। ভগবান বলিতেছেন—"শ্রীগুরুদেবকে আমারই অভিন্ন মূর্তি জানিয়া শ্রদ্ধা সহকারে অর্চন করিবে এবং তাহাতেই তোমাদের সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে।" কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত আচরণের দ্বারা আরও অধঃপতিত হই, তবুও শ্রীগুরুদেব তিনি কারুণ্যঘনমূর্তি পতিতপাবন, তাই আমাদের শত অপরাধেও সান্ত্বনা দিতে ছাড়েন না।

বিভিন্ন তিথিতে ভগবৎশক্তির অধিষ্ঠানের বার্তা আমরা পূর্বাপর শুনিতেছি। কিন্তু গুর্বাবির্ভাব তিথি সর্বাপেক্ষা করুণাময়ী। তিনি বৎসরের একটি দিন উদিত হইয়া বিশেষ স্নেহ সহকারে আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্যক্ অর্চনের বিশেষ অধিকার প্রদানে ধন্য করেন। যাঁহারা সেই তিথিবরার সুষ্ঠু সেবায় নিজেকে অঞ্জলি প্রদান করিতে পারেন, শুধু তাঁহারাই ধন্য হন না, পরন্তু তাঁহাদের জন্মে "বসুন্ধরা সা বসতি চ ধন্যা"।

জীব, গুররুদেব ও ভগবান এই তিন তত্ত্বের সম্বন্ধ-বিচারে একটি বড় সুন্দর উপমা দিয়াছেন—মহাজনগণ।

"নারায়ণোঽপি বিকৃতিং যাতি গুরোঃ প্রচ্যুতস্য দুর্বুদ্ধেঃ।
কমলস্য জলাদপৈতি রবিঃ শুষ্যতি নাশয়তি চ॥"

বলিতেছেন,—জীব হইল পদ্ম স্বরূপ, ভগবান—সূর্য্য স্বরূপ, আর গুরুদেব হইলেন জলের ন্যায়। যে প্রকার, পদ্ম জলের আশ্রয়ে থাকিলে যে সূর্য্য-কিরণ তাহাকে প্রফুল্লিত ও বিকশিত করিয়া তোলে সেই সূর্য্য-কিরণই আবার সেই পদ্মকে জলাশয়-চ্যুত হইলে দগ্ধ, সন্তাপিত ও শুষ্ক করিয়া দেয়, সেই প্রকার শ্রীগুর্বাশ্রিত জনেরই ভগবৎসম্বন্ধ পরম মঙ্গলের কারণ হইলেও শ্রীশ্রীগুর্ববজ্ঞাকারী বা গুর্বাশ্রয়চ্যুত জীবকে ভগবৎকৃপাদৃষ্টি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হয়। এই জন্য শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বলা হইয়াছে। সেই আশ্রয়-নির্ভরতা যাঁহার যতটুকু তিনি তত বড় আশ্রিত বা ভগবদ্ভক্তির অধিকারী।

গায়ত্রী সুকলীর্ত্তি-কীর্ত্তন-ধনং রাধাপদং খ্যাতি
ওঁ
নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ নদীয়া

উপমন্যু

আয়োদধৌম্য মনির উপমন্যু নামে এক শিষ্য ছিল। উপমন্যু গুরুদেবের আদেশে তাঁহার গোধন রক্ষা ও গোচারণ করিতেন। গুরুদেব উপমন্যুকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সে দিবা-ভাগে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিবে। তদনুসারে উপমন্যু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আসিয়া গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতেন।

একদিন গুরুদেব উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃৎপুষ্ট দেখিতেছি। তুমি কি আহার করিয়া থাক?" উপমন্যু উত্তর করিলেন,—'ভগবন্! আমি ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বলিলেন,—"দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষা লব্ধ কোন বস্তু গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে।" উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণ-পূর্ব্বক গুরুদেবকে অর্পণ করিলেন। আচর্য্য সমস্ত ভিক্ষান্নই গ্রহণ করিলেন, উপমন্যুকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আগমন-পূর্ব্বক গুরুদেবকে নমস্কার করিলেন। আচার্য্য উপমন্যুকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তোমার সমস্ত ভিক্ষান্নই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। তথাপি তোমাকে এরূপ স্থূলকায় দেখিতেছি কেন? তুমি কি ভোজন করিয়া থাক?" উপমন্যু বলিলেন,—"ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া নিজে ভোজন করিয়া থাকি।" আচার্য্য কহিলেন,—"দেখ ইহা শিষ্টলোকের ধর্ম্ম ও উপযুক্ত কর্ম্ম নহে, ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে। আর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িবে।"

শ্রীগুরুদেবর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া উপমন্যু আর একদিন পূর্ব্বের ন্যায় গোচারণ ও সন্ধ্যাকালে গুরু-গৃহে আগমন করিলে আচার্য্য উপমন্যুকে কহিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কর, তাহা আমি সকলই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং আমি নিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না। তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় দেখিতেছি। তুমি আজকাল কি ভোজন করিয়া থাক?" উপমন্যু বলিলেন,—"আমি গাভীগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি।" আচার্য্য কহিলেন,—"আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিবার অনুমতি প্রদান করি নাই। গুরুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।"

উপমন্যু গুরুদেবের নিকট অপরাধের ক্ষমা ভিভিক্ষা করিলেন। অন্য আর একদিন তিনি গো-চারণ করিয়া গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া প্রণতঃ হইলেন। গুরুদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস উপমন্যু, তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কিংবা দ্বিতীয়বার ভিক্ষার জন্য পর্যটন কর না। গাভীর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে স্থূল দেখিতেছি কেন? তুমি এখন কি ভোজন কর?" উপমন্যু বলিলেন,—"গোবৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি।" আচার্য্য বলিলেন,—"অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি দয়া করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি তাহাদিগের ভোজনের ব্যাঘাত করিতেছ। আর তুমি ঐরূপ করিও না।"

উপমন্যু, শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গুরু-সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন বনে গোচারণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিবেন, গুরুসেবার জন্য কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় কয়েকটি অর্কপত্র (আকন্দ পাতা) ভোজন করিলেন। ইহা ভোজন করায় উপমন্যুর চক্ষুরোগ জন্মিল এবং তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন। এইরূপ অন্ধ হইয়া একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপের মধ্যে পতিত হইলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল, অথচ উপমন্যু গোচারণ করিয়া ফিরিতেছেন না দেখিয়া আচার্য্য চিন্তিত হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট বলিতে লাগিলেন,—"আমি উপমন্যুকে সকল—প্রকার আহার হইতেই নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছি। বোধ হয়, সেই জন্য সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাই এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না।" এই বলিয়া আচার্য্য কতিপয় শিষ্যকে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও

উচ্চৈঃস্বরে উপমন্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু আচার্য্যের স্বর শুনিয়াই অতি বিনীতভাবে উচ্চকণ্ঠে কূপের মধ্য হইতে তাঁহার অবস্থা জানাইলেন।

আচার্য্য উপমন্যুর এইরূপ অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে দেবতাগণের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে উপমন্যুর চক্ষুরোগ বিদূরিত হইতে পারে জানাইলেন।

উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি পিষ্টক ভোজন করিতে দিয়া বলিলেন যে, উহা ভোজন করিলেই তাঁহার রোগ অচিরে বিনষ্ট হইবে।

উপমন্যু বলিলেন,—"আমি শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই পিষ্টক ভোজন করিতে পারি না।" অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন,—"পূর্ব্বে তোমার গুরুদেব আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার প্রতি সান্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও এক পিষ্টক দিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার গুরুর আদেশ না লইয়াই তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। অতএব তোমার আচার্য্য যাহা করিয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ কর।"

উপমন্যু কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন,—"আমি আপনাদিগকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, আপনারা আমাকে এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। আমি গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভোজন করিতে পারিব না।"

অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপমন্যুর এইরূপ গুরুভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—"তোমার দন্ত-সকল হিরন্ময় হইবে, তুমি পুনরায় চক্ষুরত্ন ফিরিয়া পাইবে এবং তোমার পরম মঙ্গল লাভ হইবে।"

উপমন্যু চক্ষু লাভ করিয়া গুরুদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। আচার্য্য ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উপমন্যুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ; সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে এবং তোমার পরম-মঙ্গল লাভ হইবে।"

মহাভারতের এই আখ্যায়িকাটিতে গুরুসেবকের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত গুরুসেবক গুরুর কোন বস্তুকে ভোগ করিবেন না। সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। গুরুদেবের আদেশ যতই কঠোর ও তীব্র হউক না কেন, গুরুসেবক অবিচলিত-চিত্তে সন্তোষের সহিত তাহা পালন করিবেন। গুরুসেবা করিতে করিতে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক, প্রাণও যদি বিনষ্ট হয়, তাহাও আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন। গুরুসেবকের বিচার এইরূপ,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

শ্রীগুরুদেবের আচরণ অনুকরণ না করিয়া তাঁহার বাণী ও শিক্ষার অনুসরণ ও পরিপালন করিলেই বঞ্চিত হইতে হয় না। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কথায় উপমন্যু তাঁহার গুরুদেবের আচরণ অনুকরণ করিয়া গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত পিষ্টক ভোজন করেন নাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মহাপুরুষের বাণীরই অনুসরণ করেন। তদ্দারাই সমস্ত অভিষ্ট লাভ হয়। যিনি এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত গুরুসেবা করেন, তিনিই পৃথিবীর সমস্ত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তাঁহারই হৃদয়ে সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হয় ও তাহা সর্ব্বকাল স্মৃতি-পথে বিরাজিত থাকে! শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই চরম মঙ্গল কৃষ্ণসেবা লাভ হয়।

শ্রীগুরুতত্ত্বের পরিশিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি হইতে উদ্ধৃত)

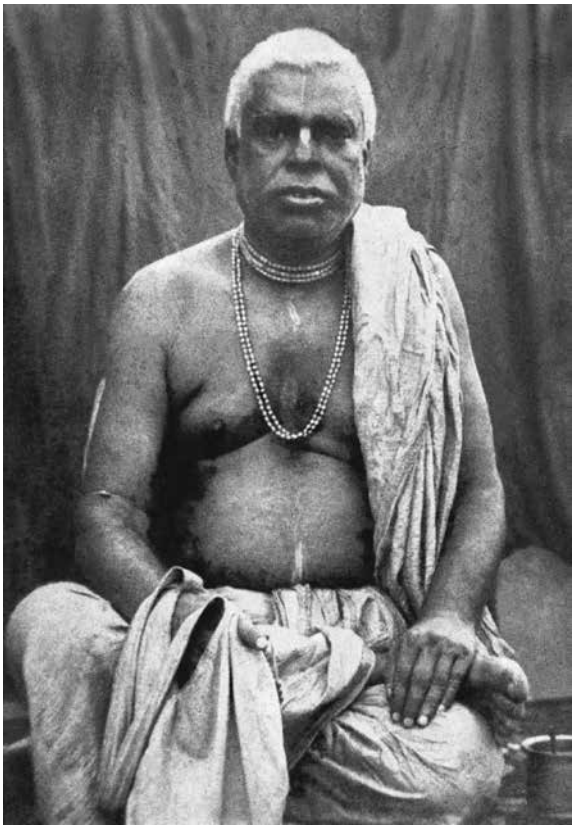

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দুঁহে কৃষ্ণদাস।
দুঁহে ব্রজজন, কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ ॥
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু—কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু ॥
এই বুদ্ধি-সহ সদা গুরুভক্তি করে।
সেই গুরুভক্তিবলে সংসারেতে তরে ॥

গুরুপূজা—

অগ্রে গুরুপূজা, পরে শ্রীকষ্ণপূজন।
গুরুদেবে শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ-সমর্পণ ॥
গুরু-আজ্ঞা লয়ে কৃষ্ণ পূজিবে যতনে।
শ্রীগুরু স্মরিয়া কৃষ্ণ বলিবে বদনে ॥

গুরুতে কিরূপ শ্রদ্ধা করা উচিত—

গুরুতে অবজ্ঞা যা'র তা'র অপরাধ।
সেই অপরাধে তা'র হয় ভক্তিবাধ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি'।
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত শীঘ্র যায় তরি' ॥
গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা করে যেই জন।
শুদ্ধনামবলে সেই পায় প্রেমধন ॥

গুরুসেবায় প্রক্রিয়া—

গুরু-শয্যাসন, আর পাদুকাদি, যান।
পাদপীঠ, স্নানোদক, ছায়ার লঙ্ঘন ॥
গুরুর অগ্রেতে অন্য পূজাদ্বৈত-জ্ঞান।
দীক্ষা, ব্যাখ্যা, প্রভুত্বাদি করিবে বর্জন ॥
যথা যথা গুরুর পাইবে দরশন।
দণ্ডবৎ পড়ি' ভূমে করিবে বন্দন ॥
গুরুনাম ভক্তিতে করিবে উচ্চারণ।
গুরু-আজ্ঞা হেলা না করিবে কদাচন ॥
গুরুর প্রসাদ সেবা অবশ্য করিবে।
গুরুর অপ্রিয় বাক্য কভু না কহিবে ॥
গুরুর চরণে দৈন্যে লইবে শরণ।
করিবে গুরুর সদা প্রিয়-আচরণ ॥
এরূপ আচারে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় প্রভো, বলে শ্রুতিগণে ॥

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় কেন্দ্রসমূহ)

সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন নং- ৭৪১৩০২ ফোন- ৯৮৫১১৯৩৩৯১

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা- ৭০০ ০৫৫
ফোন- (০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা
পোঃ- এয়ারপোর্ট, কলিকাতা- ৭০০ ০৫২
ফোন- (০৩৩) ২৫৭৩-৫৪২৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্যা,
পিন নং- ৭৫২০০১ ফোন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ সেবাকুঞ্জ রোড়, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১১২১, ফোন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিসা, পোঃ- গোবর্দ্ধন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১৫০২, ফোন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম)
গ্রাম ও পোঃ- বীরচন্দ্রপুর, জেলা- বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া, ১৫৫ নেতাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- নাদনঘাট, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- জানাপাড়া, পোঃ- মেদিনীপুর,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীল শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তিযোগ কালচারাল সন্টার
২৩৯৪, ৩য় তল, ৬ং কক্ষ, তিলক ষ্ট্রীট, চুনামণ্ডী,
পহাড়গঞ্জ, নীউ দিল্লী-১১০০৫

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার (মহিলা আশ্রম)
গ্রাম- শাশপুর, পোঃ- কালনা, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ- হাপানিয়া, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামুনপাড়া, পোঃ- খাঁপুর, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মাহাদিয়া, পোঃ- কান্দী, জেলা- মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- চকফুলডুবি, পোঃ-সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন- ০৮১৫৯৯৪২৬১৭

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার,
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্
অমৃতবোদ্যা
শ্রীশিক্ষাষ্টক
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শরণাগতি
শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

যিনি শ্রীভগবান্ ওগুরুদেবে অচলশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্য-বাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকেই বঞ্চনা করেন; কারণ তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেইবিষয় যগ্যতা আছে। শ্রীম্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবা-ব্যাতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। "পরম-সেব্য বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যাতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেস্থানে, সেস্থানেই মানবজ্ঞান-অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহারদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়।?

প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি"—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে! শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি-প্রকারে থাকিতে পারে? আন্তরিক-ব্যক্তিগণ সত্য-সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কর্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞানগম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই।

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর